# উই ওয়ান্ট জাস্টিস
## রবীন বসু

খুব সকালে ফোনটা এল।
অমলবাবু চা খেয়ে থলে হাতে বাজারে বেরিয়ে গেছেন। বিদিশা মেয়ের ঘরটা পরিষ্কার করছিল। বিছানার চাদর পাল্টে দুটো বালিশ পরপর রাখল।
একটা বালিশে ল্যাপটপ রেখে অন্য বালিশ কোলে নিয়ে কাজ করে মেয়ে। জানলার পর্দা সরিয়ে দিতে ঘরে রোদ ঝাঁপিয়ে পড়ল। পর পর দু'দিন হাসপাতালে নাইট ডিউটি শেষ করে তাদের তিরিশ বছরের মেয়ে 'তিলোত্তমা' আজ শুক্রবার সকালে বাড়ি ফিরবে। গতকাল রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ফোনে মায়ের সঙ্গে শেষ কথা হয়। নতুন গাড়ি কেনার পর থেকে নিজেই ড্রাইভ করে শহরতলি থেকে কলকাতা যাতায়াত করে। মেয়েকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছে বাবা-মা। সামনের নভেম্বরেই বিয়ে ঠিক হয়েছে। পাত্র মেয়ের পছন্দের। তার তেরো বছরের প্রেমিক। সেও ওই একই হসপিটালের মেডিক্যাল ইন্টার্ন। ছোট ব্যবসা আর রেডিমেড পোষাক সেলাইয়ের কাজ করে অনেক পরিশ্রম কষ্টে মেয়েকে ডাক্তারি পড়িয়েছে অমলবাবু। তারপর নিজের যোগ্যতা ও মেধায় 'তিলোত্তমা' এমবিএস পাশ করে এখন ইন্টার্নশিপের পাশাপাশি চেসম মেডিসিনের উপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করছে। দ্বিতীয় বর্ষ। ডিউটির পরে রাত জেগে পড়াশোনা করে। ডাইরিতে লিখেছে, আমি ভাল রেজাল্ট করতে চাই। গোল্ড মেডেল পেতে চাই।
মেয়ে নাইট ডিউটির পর ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরবে। তাই তাড়াতাড়ি সকালের রান্না সেরে নিতে চায় মা বিদিশা। মেয়ে ফিরলে যাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে বিশ্রাম নিতে পারে। স্বামীকে বার বার বলে দিয়েছেন, মেয়ের পছন্দের পাবদা মাছ যেন আনে। সঙ্গে মোচা আর কলমি শাক। ডাক্তার মেয়ের পাতে একটা শাক চাই-ই। সোফা টেবিল ঝাড়ার পর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখেন, অমল বাবু বাজার থেকে ফিরেছেন।
—এই নাও তোমার বাজার। ব্যাগ মেঝেতে নামাতে না নামাতে অমলবাবুর মোবাইল বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি মোবাইল ধরতে, ওপাশ থেকে একটা মেয়েলি গলা। — আপনি কি অমলবাবু? 'তিলোত্তমা'র বাবা বলছেন?

–হ্যাঁ। কিন্তু কেন!

–আপনাদের একবার হসপিটালে আসতে হবে। যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে আসুন।

–কেন! কী হয়েছে? উদ্বিগ্ন অমলবাবু জানতে চান। ততক্ষণে পাশে তাঁর স্ত্রী বিদিশাও এসে দাঁড়ায়।

–আপনাদের মেয়ের শরীর খুব খারাপ। সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। চলে আসুন তাড়াতাড়ি।

–কী হয়েছে বলবেন তো! গতকাল রাতে তো মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। ও তো বলেনি শরীর খারাপ! তাহলে!

ওপাশের গলায় এবার বেশ বিরক্তি। –বলছি তো চলে আসুন। তারপর একটু থেমে ঢোঁক গেলার মতো করে বলে, আপনাদের মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে অমলবাবুর। তিনি দিশাহারা। বিদিশা ডুকরে কেঁদে ওঠেন। স্বামীর হাত থেকে মোবাইল কেড়ে নিয়ে বলেন, এ কী সর্বনাশা খবর দিলেন! আমি বিশ্বাস করি না আমার মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে। গতকাল সন্ধেয় ওর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। ও আজ বাড়ি আসবে। আমি বিশ্বাস করি না।

অমলবাবু আবার স্ত্রীর হাত থেকে ফোনটা নিয়ে বলেন, আপনি কে কথা বলেছেন? ফোনের ওপাশ থেকে উত্তর এল, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। দেরি না করে এক্ষুনি হসপিটালের এমার্জেন্সিতে চলে আসুন।

ফোন কেটে গেল। বিনা মেঘে যেন বজ্রাঘাত! কান্নাভেজা কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠেন বিদিশা! –এ কী খবর এলো গো! কী হবে এখন আমাদের!

অমলবাবুও বুঝতে পারেন না, একটা সুস্থ স্বাভাবিক মেয়ে, যে নাইট ডিউটিতে ছিল, যার উপর ভার ছিল অনেক রোগীর, সে কী করে আত্মহত্যা করে! অবশ্য কিছু দিন ধরে 'তিলোত্তমা' মানসিক অশান্তির মধ্যে ছিল। ওর কথায় জেনেছে, হসপিটালের মধ্যে অনেক দুর্নীতি আছে। তারা সেগুলো জেনে গিয়েছে বলে কারা যেন তাদের শাসায়। ভয় দেখায়। পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেবে বলে। সে এও জানিয়েছিল, হসপিটালে ভিতর জাল ওষুধ চক্র আছে। কিছু শিক্ষক-ডাক্তার চাপ দেয়, টাকা দিতে হবে, নাহলে সেমেস্টারে ফেল করিয়ে দেওয়া হবে। এঁরাই আবার টাকা নিয়ে পরিক্ষায় নকল করতে দেয়। নম্বর বাড়িয়ে দেয়। প্রতিবাদ করে, অভিযোগ জানিয়ে কোনো ফল হয়নি। তাই মনমরা 'তিলোত্তমা' প্রায়ই বলত, হসপিটালে যেতে আর ভাল লাগে না। তবে কি!!

মনে অনেক প্রশ্ন ও শোক নিয়ে অমলবাবু তাড়া দেন স্ত্রীকে, তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে নাও। আমাদের কলকাতা যেতে হবে।

••

স্বামী-স্ত্রী যখন হাসপাতালের এমার্জেন্সি থেকে চেস্ট ডিপার্টমেন্টে পৌঁছল, দেখল সেখানে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। প্রেস মিডিয়ার লোকজনও হাজির। হাজির অন্য হসপিটাল থেকে আসা কৌতূহলী ডাক্তাররা। দাঁড়িয়ে থাকা একজন অফিসারকে নিজেদের পরিচয় দিতে তারা নিয়ে গিয়ে তিন তলার একটা ঘরের বেঞ্চে বসতে বলে। বিদিশা বার বার করে আবেদন করে, আমার মেয়েকে দেখতে দিন। একবার আমার মেয়ের কাছে নিয়ে চলুন।
পুলিশ অফিসার বলে, না ম্যাডাম। এখন দেখা হবে না। এখন তদন্ত চলছে। ওখানে যাওয়া যাবে না। আপনারা এখানে বসুন। আমাদের হায়ার অথরিটি আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে।
অগত্যা বিষাদগ্রস্ত বাবা-মা হাসপাতালের এমার্জেন্সির তিন তলাতে পুলিশি প্রহরায় উদ্বিগ্ন হয়ে বসে থাকে। মনে ঝড় বইছে। কখন একবার মেয়ের মুখ দেখবে। কর্তব্যরত জুনিয়র ডাক্তার নার্স তাদের কথোপকথন থেকে তাঁরা জানতে পারেন, এক ভয়ানক সত্যি। এই বিল্ডিংয়ের চার তলার সেমিনার হলের মেঝেতে তাদের আদরের একমাত্র মেয়ে ধর্ষিতা ও খুন হয়ে পড়ে আছে। তবে যে ফোনে তাদের জানাল হল, আত্মহত্যা! শেষে বেলা সাড়ে দশ-এগারোটায় এক পুলিশ অফিসার এসে তাদের চার তলার সেমিনার রুমে নিয়ে যায়। চমকে ওঠেন হতভাগ্য বাবা-মা! ঘরের এক কোণে একটা নীল ম্যাট্রেসের উপর পড়ে আছে তাদের আদরের মেয়ের দেহ। শরীরে নিচের দিকে পোষাক নেই, একটা নীল কম্বল জড়ানো। একটা হাত ভাঙা। গায়ে অজস্র কাটাছেঁড়া ক্ষত। নখের দাগ। গলায় চেপে ধরার কালশিটে দাগ । মাথায়ও একটা ক্ষতচিহ্ন! নাক মুখ কান দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে! সহ্য করতে পারলেন না তারা মেয়ের এই মর্মান্তিক মৃত্যু! যেন নরখাদকরা ছিঁড়ে খেয়েছে তাদের একমাত্র আদরের মেয়ের পালক-নরম শরীর! ছুটে গেলেন অফিসারের দিকে।
–আপনারা যে ফোনে বললেন, আমাদের মেয়ে আত্মহত্যা করেছে! এ তো আত্মহত্যা নয়! অনেকে মিলে নৃশংস ভাবে খুন করেছে! আমরা এই মৃত্যুর বিচার চাই।

পুলিশ অফিসার তাদের জোর করে আবার নিচের ঘরে নিয়ে যায়, এবং এক রকম ঘরবন্দি করে। চোখের সামনে ভাসছে মেয়ের রক্তাক্ত মৃতদেহের ছবি। মর্মান্তিক শোকে পাষাণ মূর্তির মতো বসে থাকেন তাঁরা। বাইরে জরুরি বিভাগের সামনে ততক্ষণে মেয়ের সহপাঠী জুনিয়র ডাক্তার, রিসার্চ স্কলার, সিনিয়র নার্সরা সমবেত ভাবে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। তারা কেউ-ই ডাক্তার 'তিলোত্তমা'র এই মৃত্যু ও ধর্ষণকে মেনে নিতে পারছে না। তারা নিরপেক্ষ তদন্ত চায়। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চায়। দৃপ্ত কণ্ঠে আওয়াজ তোলে – উই ওয়ান্ট জাস্টিস!

দুপুরের দিকে তাদের জানাল হল, বডি পোস্টমর্টেম হলে, তারপর বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে। একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার অমলবাবুদের জেরা শুরু করলেন। আপনাদের মেয়ে কি অবসাদে ভুগছিল? এর আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি–

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই সমস্বরে বলেন, না। ওসব কিচ্ছু না। আমাদের মেয়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। ওকে কারা হত্যা করেছে আপনারা তদন্ত করে বের করুন।

বিকেলের দিকে পোস্টমর্টেম শেষ হতে, সাদা শববাহী গাড়িতে করে তড়িঘড়ি মেয়ের মৃতদেহ নিয়ে, সঙ্গে অনেক পুলিশের গাড়ি –কোথায় যেন চলে গেল। অমলবাবু আর তাঁর স্ত্রী পাগলের মতো গাড়ির পিছনে দৌড়লেন–কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের মেয়েকে! আমাদের দেখতে দিন! কোনো উত্তর দিল না কেউ। শুধু কিছু ধুলো আর অপার শূন্যতা।

প্রায় মধ্যরাতে যখন নিজেদের খাঁ-খাঁ বাড়িটার সামনে গিয়ে পৌঁছলেন অমলবাবুরা, প্রতিবেশীদের কাছে শুনলেন স্থানীয় এমএলএ, কাউন্সিলর ও থানার ওসি দাঁড়িয়ে থেকে তাদের মেয়ের ডেডবডি দাহ করে দিয়েছে। শেষ দেখা হল না। মনে প্রতিবাদের ঝড়! কেন, কী অপরাধে তাদের ফুলের মতো মেয়েটির এই পরিণতি হল! কর্তব্যরত এক নারী চিকিৎসককে সরকারি হাসপাতালের মধ্যে ধর্ষিতা হয়ে খুন হতে হয়! বাবা-মাকে দেহ দেখতে না দিয়ে গোপনে কেন দাহ করা হল! এ কী প্রমাণ লোপাট করতে! সরকারের যেখানে উচিত ছিল সঠিক তদন্ত ও দোষীদের ধরা, সেখানে দোষ লুকোবার যেন আপ্রাণ চেষ্টা করছে পুলিশ প্রশাসন।

জল কিন্তু অনেক দূর গড়াল। 'তিলোত্তমা'র ধর্ষণ ও মৃত্যু ঘিরে হসপিটালের জুনিয়র-সিনিয়র সব ডাক্তাররা রাগে ফেটে পড়লেন। প্রতিবাদে জুনিয়র ডাক্তাররা কর্মবিরতি ও

অবস্থান আন্দোলন শুরু করল। কেস হাইকোর্ট ঘুরে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছল। সমস্ত নাগরিক সমাজ পথে নেমে 'তিলোত্তমা'র হত্যার বিচার চাইছে। কর্মস্থলে মেয়েদের নিরাপত্তা চাইছে।
এর মধ্যে একজনকে হত্যাকারী হিসেবে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। সে সিভিক পুলিশ। ওই হসপিটালে তার যাতায়াত ছিল অবাধ। সেদিনের সিসিটিভি ফুটেজে তাকে হসপিটালে ঢুকতে ও বেরতে দেখা গেছে। কিন্তু অমলবাবু ও বিদিশার মতো হসপিটালের বেশির ভাগ ডাক্তার নার্সদের ধারণা ও বিশ্বাস—এই নারকীয় ঘটনার পিছনে ওই একটি ছেলে নেই। আরো অনেকে আছে। আর তাদের আড়াল করতেই হসপিটাল কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলের দেয়াল ভেঙে দেয় ও অন্যান্য প্রমাণ মুছে ফেলে। সুপ্রিম কোর্টে সরকার পক্ষ ভর্ৎসিত হয় প্রমাণ সংরক্ষণ না করে, এমন একটা সেন্সিটিভ ইস্যুতে মৃতদেহ সংরক্ষণ না করে রাতারাতি পুড়িয়ে দেওয়ায়। প্রতিবাদে দেশ জুড়ে গড়ে ওঠে ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। ছাত্র ডাক্তার, শিক্ষক অধ্যাপক অভিনেতা-অভিনেত্রী আইনজীবী ও সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে পড়ে। বিশেষ করে নারী সমাজ!

••

মৃত্যুর কয়েক মাস কেটে গেছে। বিচার এখনো আসেনি। কেস পুলিশ থেকে সিবিআইয়ের হাতে গেলেও দোষীরা সব ধরা পড়েনি। স্বাধীনতা দিবসের মধ্যরাতে দেশে বিদেশে সব জায়গার মেয়েরা মোমবাতি হাতে রাস্তায় নেমে এসেছে। তারা মধ্যরাতে রাজপথ দখল নিয়েছে। মুখে একটাই কথা—বিচার চাই! বিচার চাই! 'তিলোত্তমা'র বিচার চাই!
শোকাচ্ছন্ন অমলবাবু-বিদিশা তাদের অন্ধকার বাড়ির এক চিলতে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। মনে ক্ষোভ, মেয়ের মৃত্যুর সঠিক বিচার পাবেন তো! বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে তখন হাজার হাজার মেয়েরা মিছিল করে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের প্রতিবাদী হাত মুষ্ঠিবদ্ধ! গলায় তীব্র রোষ! সন্তানহারা বাবা-মা চোখে জল নিয়ে দেখলেন তাদের ডাক্তার মেয়ের মৃত্যুর বিচার চেয়ে কত মেয়ে আজ পথে নেমেছে! তাদের সম্মিলিত দৃপ্ত কণ্ঠ— উই ওয়ান্ট জাস্টিস!